যায়যায়দিন

তারিখ 16 APR 2007 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উচ্চ শিক্ষা এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

সাহাবুল হক

(১৪ এপ্রিল প্রকাশিত অংশের পর)

কৌশলপত্রে আরো যা রয়েছে

কৌশলপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার বিভিন্ন আইন যৌক্তিককরণের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে একটি অভিন্ন নীতিমালা তৈরির কথা বলা হয়েছে। যে নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হবে সব বিশ্ববিদ্যালয়। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভূমিকা রাখতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিশ্চিত করতে সরকারের প্রভাবমুক্ত 'অ্যাকৃডিটেশন কাউন্সিল' গঠনের সুপারিশ করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার মানকে আরো উন্নত করতেও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এসেছে কৌশলপত্রে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নত করতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারিকুলাম সব সময় আধুনিক রাখতে হবে। পরিবর্তন আনতে হবে সিলেবাসে। শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যৌথ ভিত্তিতে গবেষণা ও শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

শিক্ষকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য কয়েক দফা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত সুপারিশ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও বহিঃকমিটি দিয়ে অডিট পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতি, একাডেমিক ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে হবে। গবেষণার প্রতি শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে ফেলোশিপ ও সম্মানী ফান্ড দিতে হবে। এ জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, গবেষণা প্রকল্পে বেসরকারি উদ্যোক্তারা স্পন্সর বা কো-স্পন্সর করতে পারে। দাতাগোষ্ঠীরা পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের বিদেশ গমন ও জীবন-যাপনের খরচ বহন করতে পারে। শিক্ষকদের জন্য সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক লাইব্রেরির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

কৌশলপত্রে গবেষণামূলক কার্যক্রম আরো বাড়ানোর জন্য জাতীয় গবেষণা পরিষদ গঠন করার সুপারিশ করা হয়। এ পরিষদ বিভিন্ন দাতা সংস্থাসহ অন্যান্য উৎস থেকে গবেষণা অর্থায়নে সহায়তা করবে। এছাড়া দেশের প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক, আইনগত ও সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে বিশ্ব মানের শিক্ষা ও গবেষণা কৌশল নির্ধারণ করতে একটি পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে আইসিটি খাতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে কৌশলপত্রে এ খাতে উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশি উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিজিটিং প্রফেসর আনা এবং আইসিটি বিষয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা দেয়া।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে করণীয়

২০২৬ সালের মধ্যে কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি অনুধাবন করা যায় যে, অর্থ ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং বেতন বৃদ্ধিতে ছাত্রদের বিরোধিতা কৌশলপত্রের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ সহজ হবে না।

■ উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ এমন ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ করে দিতে হলে ২০২৬ সালের মধ্যে অন্তত ২৮টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

■ এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার জন্য ২১৬.১৮ বিলিয়ন টাকার প্রয়োজন।

■ এখানে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে ৮ হাজার নয়জন, ও কর্মকর্তা ২৬ হাজার ৬৯৫ জন।

■ নতুন একটি অর্গানোগ্রাম তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে। কমিশনকে পর্যাপ্ত বাজেট ও দায়িত্ব পুনর্নির্ধারণ করে দিতে হবে।

■ আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে একটি গবেষণা/পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৩ বিলিয়ন টাকা।

■ গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার খরচ বাড়াতে হবে।

■ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে একটি জাতীয় শিক্ষার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই তথ্য প্রযুক্তি অধ্যয়ন করতে পারে।

■ দেশের বিভাগীয় পর্যায়ে ছয়টি অপারেশনাল সেন্টার স্থাপন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন করতে হবে।

■ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের বাজেট ঘাটতি হ্রাসে নিজস্ব আয়ের খাত সৃষ্টি করতে হবে।

■ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন বেতন ধার্য ও ছাত্রঋণ চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষ কথা

দেশে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা কম হয়নি। যখনই যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সুশীল সমাজের দাবি অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষাকে সংস্কার করে তারা ঢেলে সাজাতে চেয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ ইচ্ছা শুধু নরম-গরম বক্তব্য আর বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সত্যিকার অর্থে উচ্চ শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন আনতে কোনো সরকারই সফল হয়নি। ফলে উচ্চ শিক্ষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে অনিয়ম, দুর্নীতি আর সীমাহীন নৈরাজ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ ধারা, যার দরুন নষ্ট হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ। ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবাধ স্বাধীনতা দিলেও তাঁদের ন্যূনতম জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে পারেনি। প্রচলিত ভোটাভুটির রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্যায়ের লালনকে সহজ করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন ও বর্ণের আবরণে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক চরিত্রকে ধ্বংস করে রাজনৈতিক চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলছে। রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যের চেয়ারগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়। '৭৩-এর অধ্যাদেশ এ ক্ষেত্রে বড়ই অসহায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সিনেটও এ সময় থাকে নিশ্চুপ। কারণ এ সবই সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে বদল হয়ে যায়। সরকারের প্রতিনিধিদের দিয়েই এগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে ৪২ জন সদস্যকে। এক কথায় বলা চলে, সরকার যার সিনেট-সিন্ডিকেট তার।

উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এতো বেশি দলাদলি ও রাজনীতি হয় যে, অনেক সৎ ও যোগ্য লোকই শেষ পর্যন্ত উপাচার্য হতে পারেন না। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ততার কারণে অনেক অযোগ্য ও অসৎ লোক উপাচার্য হয়ে যান। এর অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর। ন্যূনতম প্রশাসনিক যোগ্যতা নেই এমন অনেককে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রো-উপাচার্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। এছাড়া উপাচার্য প্রো-উপাচার্যদের অনেকের দুর্নীতির খবরাখবর আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাচার্য পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উপাচার্য প্রো-উপাচার্য পদগুলো যতোটুকু না শিক্ষাবিদদের তার চেয়ে বেশি রাজনীতিকদের।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ হ্রাসের পরিবর্তে ক্রমেই তা বাড়ছে। এ সব অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় নাম মাত্র তদন্ত কমিটি গঠন করলেও তদন্ত রিপোর্টগুলো অধিকাংশ সময়ই আলোর মুখ দেখে না। কারণ শিক্ষক-কর্মকর্তাদের তদন্ত ক্যাম্পাসের শিক্ষকরাই করে থাকেন। আর সেখানে রয়েছে বর্ণ সংক্রান্ত রাজনীতির ব্যাপার। দুর্নীতি কিংবা অনিয়মের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছেন কিংবা শাস্তি পেয়েছেন এমন নজির আমাদের সামনে নেই। এছাড়া এসব বিষয় আলাদাভাবে তদন্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো শাখা বা দফতর নেই যার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্তা ব্যক্তিরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন সেখানে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করবে কে? এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তেমন কোনো ক্ষমতা না থাকায় তারা শক্তিশালী কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে অতিসম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম এরশাদুল বারীকে সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে তাঁর ওই পদ থেকে অপসারণ করেছে। কমিশন আরো আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে '৯০ পরবর্তীকালে এ ধারা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে অধিকাংশ নিয়োগ হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। খুব ভালো ফলাফল করেও রাজনৈতিক যোগাযোগ না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সম্মান ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি হয় না এমন ঘটনাও ঘটেছে। টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হওয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের খবর হলো, কলেজ পর্যায়ে অনার্স-মাস্টার্স করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে।

১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ দ্বারা দেশের বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হলেও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কিছু নীতিমালা রয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেক নিয়ম বিদ্যমান। অভিযোগ আছে, একটি মাত্র প্রবন্ধ লিখে বা কোনো প্রবন্ধ ছাড়াই প্রফেসর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন কেউ কেউ। রাজশাহী ও চট্টগ্রামে পদোন্নতির যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তা খুবই দুর্বল।

শিক্ষা সংস্কারের জন্য ইতিপূর্বে বিভিন্ন কমিটি-কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশন, ১৯৬৪ সালের হামুদুর রহমান কমিশন, ১৯৭০ সালের নিউ এডুকেশন পলিসি, ১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা কমিশন, ১৯৭৭ সালের ইউনিভার্সিটিজ ইনকোয়ারি কমিশন, ১৯৭৮ সালের কাজী জাফর আহমদ কমিশন, ১৯৮৮ সালের মফিজ উদ্দিন কমিশন, ১৯৯৭ সালের শামসুল হক কমিশন, ২০০২ সালের আবদুল বারী কমিশন এবং ২০০৩ সালে গঠিত মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সব কমিশনের খুব কম সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়েছে। গত দেড় যুগের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারাই নতুন করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। এক কথায় নতুন সরকারের জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এক সরকারের রেখে যাওয়া শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আরেক সরকার এসে তাকিয়েও দেখে না। অথচ প্রতিটি কমিশনেই শিক্ষা সংস্কারের অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে।

মঞ্জুরি কমিশনের কৌশলপত্রে দেশের উচ্চ শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে

অং পৃঃ দ্রঃ